ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (রচনা) ক্লাস ১০

(rrc3nd9)

১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহন করেন। তার বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা ভগবতী দেবী। ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল কাটে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর লড়াই করে। সেদিন কেউ কল্পনাও করতে পারেনি তার কীর্তি একদিন দেশ জুড়ে খ্যাতির শীর্ষে উঠবে। দারিদ্র্যের মধ্যেই গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করেন। তার বাবার ইচ্ছা ছিল তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হোক। পায়ে হেঁটে বাবার সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার পথে মেদিনীপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত মাইল স্টোন দেখে দেখে ইংরাজি সংখ্যা আয়ত্ব করে ফেললেন। আগ্রহ, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় দিয়ে জ্ঞানলাভের ইচ্ছা তাকে সারাজীবন সচল করে রেখেছিল। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে সুপন্ডিত হলেন আর তারপর পাশ্চাত্য শিক্ষায়ও সমন্বয় আনতে উৎসাহী হলেন। বেদান্ত, ন্যায় ইত্যাদি নানা শাস্ত্রে সুপন্ডিত হয়ে পেলেন *বিদ্যাসাগর* উপাধি। বিদ্যাসাগর তার পিতা ও পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ কারো কাছ থেকে আর্থিক সম্পদ না পেলেও পেয়েছিলেন মহত্ম ও তেজস্বী স্বভাব। বাবা ঠাকুরদাস দিয়েছিলেন কষ্টসহিষ্ণুতা, সংগ্রামশীলতা ও প্রখর আত্মমর্যাদা জ্ঞান। মা ভগবতী দেবী ভরিয়ে দিয়েছিলেন সেবা, করুণা আর কোমলতায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পন্ডিত হিসাবে। তাঁর পান্ডিত্য আর কর্ম ক্ষমতার গুনে অধ্যাপক হন সংস্কৃত কলেজে ও পরে অধ্যক্ষ পদে। আবার সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুরোধে অতিরিক্ত স্কুল পরিদর্শকের কাজ নেন। শিক্ষা সংস্কারের অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে, নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগর তার বর্ণপরিচয়ে লিখেছিলেন গোপালনামে একটি ছেলে তার মা বাবা যাই বলেন তাই সে করে। কিন্তু রাখাল ছিল তার উল্টো। ছোটবেলায় রাখালের সঙ্গে যে বেশি মিল ছিল একথা তার ভাই শম্ভুচরণ বলেছিলেন। তাকে পরিষ্কার কাপড় পরে কলেজে যেতে বললে ময়লা কাপড় পরে যেত। স্নান করে যেতে বললে না করে যেত। তার বাবা তার স্বভাব বুঝে যা করাতে চাইতেন তার উল্টোটা বলতেন। এতে কাজ হত। কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সঙ্গে মিল ছিল না। বালক ঈশ্বরচন্দ্রের পড়াশোনায় কোন শৈথিল্য ছিল না। রাত দশটার সময় শুতে যাবার আগে বাবাকে বলতেন বারোটায় জাগিয়ে দিতে। তারপর তিনি সারারাত জেগে পড়তেন। এতে মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

কলকাতার বাসায় তার বাবা ও মেজো ভাই থাকতেন। সেখানে কোন কাজের লোক ছিল না তাই সবার জন্য রান্না করে খাওয়ার পর বাসন ধুয়ে রাস্তার ধারের গ্যাসের আলোয় পড়তে যেতেন। মাসিক বৃত্তির টাকায় সহপাঠীদের টিফিন খাওয়াতেন। দুস্থদের দুঃখ সইতে পারতেন না। সবসময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। জীবনের প্রথম থেকেই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে

জয়লাভ করেছেন। তার মতো অবস্থায় যেখানে পড়াশোনা করাই কঠিন সেই গ্রাম্য ছেলে শীর্ণ খর্ব দেহ ও প্রকান্ড মাথা নিয়ে অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেছিলেন। নিজের কোন অসুবিধা তাকে পরের উপকার করা থেকে বিরত করতে পারেনি। তাই বুঝি দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান দয়ারসাগর নামে পরিচিত রইলেন।

তিনি এই সমাজের কুসংস্কারের অবসান চেয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন করে, শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিধিনিষেধ ভেঙেছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন - বিধবা-বিবাহ প্রচলন তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো কাজ। তার মায়ের আদেশেই তিনি এই কাজে এগিয়ে ছিলেন।

বেথুন স্কুল, মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল, এই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ও পাঠ্য নির্বাচক কমিটির সদস্য হন। তাছাড়া শিক্ষা জগতের সংস্কারে যেমন এগিয়ে এলেন, তেমন সাহিত্য ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের বিষয়ে গ্রন্থ রচনা তাঁর এই সময়ের কাজ। এছাড়াও পৌরাণিক কাহিনী সহ আরো নানা বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন যা পড়লে তাঁর দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের প্রকৃত পরিচয় তিনি করুণাসাগর, দয়ার প্রতিমূর্তি। তিনি মানব প্রেমিক। আর্ত, ব্যথিত নিরন্নের হাহাকার শুনলে হৃদয়ের করুণা দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন। কতজনকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার কোন তুলনা নেই। কিন্তু শুধু কি দয়া? তা নয়, বিদ্যাসাগরের আসল পরিচয় তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা।
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতায় বলে গেছেন:

‘বীরসিংহের সিংহ শিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!
উদ্‌বেলিত দয়ার সাগর - বীর্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।’

(c) arked infotech 2014